দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...2. OCT 1987 ... ...
পৃষ্ঠা... .. ... 5 কলাম ..3... ...

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গঃ কর্মমুখী শিক্ষা

শিক্ষার সাথে কর্মের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। কর্মযোগহীন শিক্ষা ব্যবস্থা বেকারত্বের মতো অভিশাপে সমাজকে পঙ্গু করে ফেলে। অপরদিকে, শিক্ষাঙ্গন হতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠুক—এটাই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য। কিন্তু সমাজের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয়সংখ্যক ডাক্তার, প্রকৌশলী, কারিগর, যন্ত্রবিদ, কৃষিবিদসহ বিভিন্নমুখী পেশায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠার যথাযথ সুযোগ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। এখানে শিক্ষা ব্যবস্থার সিংহভাগ জুড়ে আছে সাধারণ শিক্ষা। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা এ ব্যবস্থায় অবহেলিত।

মধ্যমিক শিক্ষার সংক্ষিপ্ত বিরণী হতে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩০ লাখ ২০ হাজার ৭শ' ৭৭ জন। কিন্তু কারিগরি শিক্ষাসহ বিভিন্ন কর্মমুখী শিক্ষায় এ সংখ্যা ছিল ৩১ হাজার ৯শ' ৬০ জন, যা যথাক্রমে মোট শিক্ষার্থীর ৯৯% ভাগ এবং ১% ভাগ। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এ অস্বাভাবিক চিত্রের জন্য দায়ী শিক্ষা কাঠামো ও সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা। এখানে উল্লেখ্য, বৃটিশরা এদেশে এসেছিল সম্পদ নিতে, তাই তাঁদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা এ পথকেই প্রশস্ত করেছিল।

কেরানী ও সেবাদাস সৃষ্টিই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। এ ব্যবস্থা স্বাধীন সার্বভৌম দেশে চলতে পারে না। তবে, সাধারণ শিক্ষা যে থাকবে না তা নয়, প্রয়োজনের নিরিখে পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি পর্যাপ্ত কর্মমুখী শিক্ষাও থাকতে হবে।

দেশের মোট বোকারের সংখ্যা তৃতীয়-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ছিল ১ কোটি ১৮ লাখ, যা ৯০ সাল নাগাদ দাঁড়াবে ১ কোটি ২৫ লাখে। ১৯৭৩ সালে মাধ্যমিক পর্যায় ও তদূর্ধ্ব যোগ্যতাসম্পন্নদের প্রায় অর্ধেক ছিলো বেকার। পরিকল্পনা কমিশনের শেষ সমীক্ষা মতে, মাধ্যমিক পর্যায়ে বা তদূর্ধ্ব সনদধারীদের ৪০% ভাগই বেকার। বিষয়টি ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থাই এর জন্য বেশীর ভাগ দায়ী। এ অবস্থার সমাধান যে নেই তা নয়।

সমাধানের লক্ষ্যে দ্বি-মুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ দেশের উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডের সাথে সংযোগ রেখে জনশক্তির দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যাতে সকলেই বুঝতে পারে কোন্ ক্ষেত্রে কত জন শিক্ষিত, কত জন আধা-শিক্ষিত, কত জন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কত জন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত আছে এবং প্রয়োজন হবে।

দ্বিতীয়তঃ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন প্রয়োজন যে শিক্ষা জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারবে না। সে শিক্ষার কাজ কি? শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির পরিস্ফুটন ঘটবে এবং সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের উপযুক্ততা লাভ হবে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হবে। চাকরি না পেলে জ্বলেপুড়ে মরার কোন কারণ নেই। সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার পেক্ষাপটে ন্যূনতম শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার বিষয়বস্তুতে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকলে যাতে পড়াশুনা করে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ শিক্ষাকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে তজ্জন্য পাঠক্রমে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটানো প্রয়োজন। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা করলে একটা বৃত্তিমূলক শিক্ষা হাতে-কলমে শেখানো যেতে পারে। যাতে করে শিক্ষার্থীরা এ পর্যন্ত শিক্ষাকালে একটা বৃত্তিমূলক সংক্ষিপ্ত শিক্ষা নিয়ে কোন না কোন পেশায় নিয়োজিত হতে পারে। গ্রামের কৃষিভিত্তিক পরিবেশ ও শিল্পায়নের কথা এ ক্ষেত্রে সক্রিয় বিবেচনায় রাখতে হবে।

বর্তমান নবম ও দশম শ্রেণীতে যে পাঠক্রম চালু আছে তা গুণগতভাবে কতটুকু অগ্রসরমান এবং আত্মনির্ভরশীল ও কর্মোদ্যোগী হবার পক্ষে যথেষ্ট তা বিচার্য। ঐচ্ছিক তালিকার বিষয়গুলো যেমন উচ্চতর বাংলা, আরবী, ইংরেজী, ফার্সী, উর্দু, সংস্কৃত, পার্সী, উচ্চতর গণিত, ললিত কলা, আমাদের দেশের মতো অনুন্নত ও দরিদ্র দেশের শিক্ষার্থীকে কতটুকু কর্মোদ্যোগী বা আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে সক্ষম তা ভেবে দেখা উচিত।

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত পরিবেশ ও জীবন যাত্রা, স্থানীয় অর্থনীতির কর্মধারা ও কর্মজীবনে প্রবেশের ভবিষ্যত কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য বিষয়ের প্রতিফলন পাঠ্যসূচীতে থাকা প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষা ছাড়া যেসব বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিষয়াদি পড়ানো হয় এ গুলোর বিষয়বস্তু দেশের সমকালীন আর্থ-সামাজিকতার প্রেক্ষাপটে চিন্তাভাবনা করে সামগ্রিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ঢেলে সাজাতে হবে এবং বাস্তবভিত্তিক করে পাঠক্রম প্রণয়ন করতে হবে।

—মোঃ আব্দুস সাত্তার

টেক্সট বুক বোর্ডের ব্যাখ্যা

বিগত ২০ আশ্বিন দৈনিক ইনকিলাবে মাহমুদা খানমের লেখা 'কোন্ তথ্যটি সঠিক?' শিরোনামে প্রকাশিত পত্রটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের সঠিক সনটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন ইতিহাস ও সাহিত্য গ্রন্থে এই সনটি ১২০১ থেকে ১২০৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে উল্লেখিত আছে। তবে সর্বশেষ ঐতিহাসিক গবেষণা ও প্রমাণাদি দ্বারা ইতিহাসবেত্তা ও বিশ্লেষজ্ঞগণ এই সিদ্ধান্তে উপণীত হন যে, ১২০৪ খৃস্টাব্দে এই বিজয় সম্পন্ন হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত মাধ্যমিক স্তরের 'বাংলাদেশের ইতিহাস' পাঠ্যবইয়ে ১২০৪ খৃস্টাব্দেই উল্লিখিত আছে। তবে নবম-দশম শ্রেণীর জন্য প্রণীত 'মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য' পাঠ্যবইয়ে "আমাদের ভাষা ও সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখিত সনটি (১২০১) সংশোধন করে ১২০৪ খৃস্টাব্দ করা হয়েছে যা ১৯৮৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত সংস্করণে দেখা যাবে।

'খলজী' ও 'খিলজী' সম্পর্কে বক্তব্য হলো এটি একটি তুর্কী শব্দ এবং বংশের নাম। সাধারণত ইতিহাস শব্দটি 'খলজী' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাই সঠিক বলে ধরে নেয়া যায়। তার কোন কোন সাহিত্য পুস্তকে এটি 'খিলজী' বলে উল্লেখ আছে।

—সুফী মোতাহার হোসেন,
প্রধান সম্পাদক,
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড,
ঢাকা।